Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 45-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প : গ্রামীণ রাজনীতি

মোঃ আলাউদ্দিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্ব-ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

*30th of the last century, Tarashankar Banerjee shifted his focus of rural life. Kathasahityik Manik banarjee focused on the complexities and intricacies of rural life. But in the post partition Bengali Literature, the **In** the modern Bengali Literature, the rural life, up to a certain extend got neglected focusing mainly on the urban life and its urban characters**.** In the rural life painted in the novels and short Stories of Kathasahityik Syed Mustafa Siraj found sea change from Predecessors. The rustic simplicity and maternal nature of Bibhutivusan Banerjee got little space into contemporary Bengali literature. Infact Politics got intermingled with the rustic life. Syed Mustafa Siraj displayed in his writings how politics affected the rustic life of lowers, Middle and upper class people in the society. This fact has been portrayed beautifully specially in the short stories of syed Mustafa siraj like 'Akkurer golpo', 'Dalim gacher jinnti', 'chobir Manush', Srot' 'Rustom o Sohoraber britannto', 'Mati', and 'Gachti bolechilo' etc .*

Key words: rural life, complexity, post partition, rustic life, contemporary etc.

নবাবী শাসনের অবসান, সামন্ততন্ত্রপ্রথার ক্রম অবলুপ্তি, ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের হাত ধরে,যাঁরা ছিলেন নগর কলকাতায় বসবাসকারী। উনিশ শতক থেকে একেবারে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত কাল হল সাহিত্যিক ও সমালোচক গোপাল হালদারের ভাষায় **'ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যুগ বা 'বাঙালি ভদ্রলোকের যুগ'।**[১] তাই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে গ্রামীণ বা পল্লীসমাজের কথা থাকলেও তাতে- যথাযথভাবে সেই গ্রামীণ রূপগন্ধ নেই। এই সমস্ত কালজয়ী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে গ্রাম শুধুমাত্র একটি ছায়া রূপে এসেছে। আসলে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যবিত্ত সুলভ জীবনভাবনা ও চিন্তাভাবনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর খানিকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবন বেশি করে উঠে এল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে এই গ্রামীণ বা প্রান্তীয় জীবনের কথা বেশি করে দেখা গেল। উত্তর উপনিবেশ পর্বে নগরবাসী বাঙালি মধ্যবিত্তের নজর নগর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামগঞ্জে। কিন্তু এই গ্রামীণ জীবন উঠে এসেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশভাগ ও লেখকের দেখা জীবন ও অভিজ্ঞতার পূর্বের স্মৃতি রূপে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষে বা ষাটের দশকের প্রথম দিকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

কথাসাহিত্যে এই গ্রামীণ জীবন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, যা তিনি আজীবন দেখে এসেছেন। এই গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখা যেন তাঁর কাছে দায়বদ্ধস্বরূপ মনে হয়েছে:

> *বাংলা সাহিত্যের বিষয় অধুনা নগরকেন্দ্রিক। গ্রামের সঙ্গে শিক্ষিত পাঠকের-যাঁদের বেশিরভাগ নগরবাসী, কোনো যোগাযোগ আর নেই। এতে সাহিত্যের কতটা উন্নতি ঘটেছে জানিনা-কিন্তু বিশাল একটা আত্মপ্রবঞ্চনা ঘটেছে। জনসংখ্যার এক প্রকাণ্ডঅংশ গ্রামবাসী।স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামে প্রচণ্ড রকমের বিপ্লব ঘটে গেছে।তার অনেক বিচিত্র ভাঙাগড়া ও রূপান্তরের আমি সাক্ষী। তাই স্বভাবত আমার লেখক ভূমিকায় একটা গুরুতর দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে। তা কতটুকু পালন করতে পেরেছি।*[২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাল্য ও যৌবনকাল কাটিয়েছেন মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুর গ্রামে। এই সময়ে তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখেছিলেন তাদের সহজ সরল রূপ। যে আদর্শ গ্রামীণ সমাজের রূপ তিনি দেখেছিলেন, আজ সেই গ্রামীণ সমাজ রাজনীতির প্রভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনিও যৌবন কালে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর পিতা যোগ দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর সেই সূত্রে বাড়িতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের যাতায়াত লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এই রাজনীতির সঙ্গে বর্তমান রাজনীতির তফাৎ লক্ষ্য করেছেন চরমভাবে। এখন লোকে রাজনীতি করছেন ধনী হওয়ার জন্য। গ্রামজীবনের রূপান্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, **"...এখন আর সে গ্রাম নেই। গ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চায়েত ঢুকে। আজকে গ্রামে কোন মানুষকে আপনমনে গান করতে শুনিনা। এর চেয়ে সাংঘাতিক কি কিছু হতে পারে। আগে গ্রামে গেলে, রাত্রিবেলায় গান গাইতে গাইতে লোকে বাড়ি ফিরছে - শুনতে পেতাম। এখন কেউ গান গায়না, শুধু পঞ্চায়েতি আর দলাদলি"।**[৩]

ধর্ম ও রাজনীতি এদের সরলতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও তার দৌলতে বিশ্বের কোন খবর তাদের কাছে অজানা নয়। অতীতে যেখানে রাজনীতি ছিল জনজীবনের বহিরঙ্গ দিক। আজ রাজনীতি সাধারণ মানুষের অস্থি মজ্জার মধ্যে মিশে গেছে। অতি দরিদ্র মানুষকেও এই রাজনীতির জালে জড়াতে হয়, তা না হলে তাঁর পক্ষে গ্রামে টিকে থাকাও অনেক সময় হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পগুলিতে এই চিত্রমালা খুঁজে পাওয়া যায়। ষাটের দশক থেকে আশির দশকে লেখা ছোটগল্পগুলিতে স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশ সমস্যা, পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং ভূমিসমস্যা বা ভূমিসংস্কার কেন্দ্রিক রাজনীতি আর তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে।

পূর্বে কংগ্রেস সরকারকে গ্রামে এই অর্ধেকের বেশি বসবাসকারী অশিক্ষিত খেটে খাওয়া গ্রামীণ মানুষ ও তাদের জীবনের সমস্যার দিকে কোন গুরুত্ব বা নজর দিতে দেখা যায়নি। তার জন্য সরকারের দ্বারা এই গ্রামে কোন সরকারী সংগঠনও গড়ে তোলা হয়নি আর গ্রামীণ মানুষের জনপ্রিয়তাও অর্জন করতেও পারেনি কোন দিন। কিন্তু সত্তর দশকের শেষের দিকে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আর শুরু হয় পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক রাজনীতি। কর্মসূচী হিসেবে সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'অপারেশন বর্গা'। কৃষি জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্গা আইন সংশোধিত হয়ে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিকবার সাফল্য—

> *একই সঙ্গে সর্বত্র, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, সি পি আই(এম) কর্মীরা চরম দাপট দেখাতে থাকেন। এই নবোদ্ভূত রাজনৈতিক এলিটরাই হয়ে ওঠেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এলাকায় এলাকায় তাঁরাই হন সমাজজীবনের নিয়ন্ত্রা এবং স্থানীয়পুলিস ও প্রশাসন চলতে থাকে তাদেরই নির্দেশে। শুধু ক্ষমতাবানই নয়, তাঁরা বিত্তবান হতে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে দেখা যেতে থাকে যে, এলাকার দাপুটে রাজনৈতিক কর্মীটি নিতান্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন ১৯৭৭ সালে, দশ বছরের মধ্যে তিনি পাকা দালান ফেলেছে সাইকেল ছেড়ে স্কুটার বা মোটরবাইক চড়ছেন।*[৪]

গ্রামীণ সমাজের এই রূপান্তরে রাজনৈতিক প্রভাবের দিকটি যে চরমভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছিল তার প্রত্যক্ষ রূপ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। 'ছবির মানুষ' গল্পে হিংসার রাজনীতিতে মনোহর দাস পরাজিত হয়েছে। অনাদির মতো মানুষেরা রাজনীতি ও দলকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে পোড়ো ও খাস জমি দখল করে তার চিত্র উঠে এসেছে। এই মনোহর দাস যোদ্ধা হতে গিয়ে হয়েছিলেন নেহাত এক কিচেনবয়। তারপর যুদ্ধ ফুরিয়ে গেলে, **"চাষী মজুর নিয়ে রাজনীতির যুদ্ধে নামেন...বার দুই এম এল এ হতে গিয়ে হেরে ভূত হন। শেষবার অবশ্য নির্দল প্রার্থী ছিলেন। তারপর ভাঙচুর, জ্বালিয়ে দেওয়া, 'হিংসার রাজনীতি' এবং থার্ড ডিগ্রি ধোলাই এবং জেল।"**[৫] অনেক পরে তিনি আবার গ্রামে ফিরে আসলে, গ্রামনেতা প্রদ্যোত ও আনাদি আশঙ্কা করতে থাকে। হয়তো মনোহর দাস পুনরায় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলবে, তাদেরকে করবে পরাজিত। কিন্তু তাঁর আর গ্রামে থাকা হয়না। কারন গ্রামনেতারা এখন আউটসাইডারদের আর অ্যালাউ করেনি। 'গাছটা বলেছিল' গল্পে নো-ম্যানস-ল্যান্ডের গাছ নিয়ে বিরোধী দলের রাজনীতির পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। গাছের মর্ মর্ মর্ শব্দ মার মার মার হয়ে ওঠে একসময়, **"হল্লা, রণহুঙ্কার, ক্রমাগত বোমা বারুদের কটু গন্ধ। ধোঁয়া।"**[৬] ধর্মে ধর্মে এই লড়াই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, এটা ধর্মের লড়াই নয় তা **'রাজনীতিরই লড়াই'**।[৭] গ্রামীণ মানুষ আজ অজ্ঞ ও জটিলতা মুক্ত নয়। সারা দেশে পৃথিবীতে কি রাজনীতি চলছে আজ তাদের কানে অস্পষ্টভাবে হলেও আসছে। 'প্যাটলার' গল্পে গ্রামীণ মানুষের এই সর্বস্ব রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি রয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির চিত্র। ভূমিহীন বা উদ্বাস্তু সমস্যার কথা প্রসঙ্গে অঞ্চল প্রধান বজলুর রহমান আইনরক্ষক কে বলেন, **"বলবেন ভুমিহীন। বলুন স্যার। কিন্তু ভিটে ছিল। ঘর ছিল। সব বেচে খাস জায়গায় ঘর তুলল। এখন যদি ওঠাতে যাই, অপোজিশন পাটি বলবে...স্যার, এমন করে অ্যাডমিনিট্রেশন চলেনা' "।**[৮]

'স্রোত' গল্পটিতে গ্রামে প্রভাতের মতো রাজনৈতিক নেতাদের আর্থসামাজিক রূপান্তরের চিত্র দেখা গেছে। গঙ্গাধর গ্রামের বাড়ির চাবি দিয়ে শহরে গিয়েছিলেন তাঁরই বাল্যকালের বন্ধু আশুতোষের পুত্র প্রভাতের হাতে। অনেক দিন পর গ্রামে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে তাঁর নিজের বাড়িতে ঘাঁটি বেঁধেছে মস্তান গুণ্ডার দল আর রয়েছে ক্লাবঘরের সাইনবোর্ড। প্রভাত স্কুল শিক্ষক,তার সাথে সাথে করেন রাজনীতি। দুই দলের দলাদলি, ভোটের মুখে হাঙ্গামা, পাইপগান ও বোম মারার খবর আজ পুরাতন। প্রভাত পঞ্চায়েত ভোটে জিতেছে। বুঝতে বাকি থাকেনা যে মস্তান গুন্ডা গঙ্গাধরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে তা প্রভাতের রাজনৈতিক সুবিধার জন্যই। রাজনীতি করেই প্রভাত আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রভাতের পিতা কোনমতে একতলা বাড়ি বানাতে পেরেছিলেন তাও আবার পলেস্তারা করতে পারেননি। এখন তাঁর ছেলে দোতলা ঘর করেছে, পলেস্তারাতো বটেই ঘরে রঙও করেছে। গ্রামে থাকতে হলে একজন ব্যক্তিকে যে কোন এক রাজনৈতিক দলের হতেই হবে,নিরপেক্ষ থাকলে চলবেনা সেই কথা প্রভাতের কথায় ধরা পড়েছে , **"আপনি গ্রামে থাকবেন বলছিলেন। থাকলে আপনাকে হয় এদলে নয় ওদলে ঢুকতেই হবে।নিরপেক্ষতা এখন সোনার পাথরবাটি।' সে অট্টহাসি হাসতে লাগল।'গায়ে একটা দলের ছাপ্পা না পড়লে দুই দলই আপনাকে সন্দেহ করবে। এ দল ধরেই নেবে আপনি ওদলের লোক এবং ওদল ধরে নেবেই আপনি এদলের লোক। যাবেন কোথায়?"**[৯] শেষ পর্যন্ত মস্তান গুন্ডা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে নিজের বাড়িও ফিরে পায়না গঙ্গাধরের মতো ব্যক্তিরা।

মার্কসবাদী রাজনীতিতে সেইসময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এইধরনের শিক্ষকরা ধনী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল-- এই বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন তাঁর আরও অনেক গল্পে উঠে এসেছে। যেমন 'একটি অনুসন্ধান' গল্পে প্রাথমিক শিক্ষক হবিবুর রহমানের পিতা ছিল ভূমিহীন খেতমজুর। তিনি প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকের চাকরি পেয়ে রাজনীতির মধ্য দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে উচ্চ শ্রেণিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরও মস্তান গুণ্ডাদের একটি দল ছিল। এই দল তাঁকে রাজনৈতিক বা যে কোন কাজে সাহায্য করতো।

'রুস্তম ও সোহরাবের বৃত্তান্ত' গল্পটি লেখক ইরানের পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের অনুষঙ্গে গড়ে তুলেছেন। ইরানের পৌরাণিক এক বীরের নাম রুস্তম। এই রুস্তম না জেনে নিজের ছেলে সোহরাবের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বাংলার গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে- এ গল্প তারই একটি। পারু ছিল সোহরাবের রাজনীতিতে ডান হাত।কিন্তু এখন পারু বিরোধী দলে যুক্ত হয়েছে। সোহরাবের বিরোধী দল পারুর সাথে সংঘর্ষে সোহরাবের পিতার মৃত্যু হয়েছে। লোকবল আর অর্থবল যা রাজনীতিতে প্রয়োজন সে দুই-ই সোহরাবের ছিল। তাই সে হয়ে উঠেছিল চিকনপুরের গ্রামনেতা। সে এখন আর গ্রামনেতা নয়, দেশনেতা। তার ক্ষমতা আরও বেড়েছে। সোহরাব এখন ভালই আছেন, বিবেকবোধে আজ যে সে পীড়িত তা কিন্তু নয়। প্রাচীন ফার্সি কাব্যের নায়ক না জেনে নিজের পুত্রকে হত্যা করেছিল কিন্তু আজকের সোহরাব হয়েছে পিতৃঘ্ন। এই গল্পেই মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখা গিয়েছে তথাকথিত আশরাফ বা খানদানি মুসলমানদের। তাদের কাছে এই রাজনৈতিক দল যেন শুধু চাষাভুষো মানুষদের। তাই পরবর্তীকালে এক দল ছেড়ে দিয়ে যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পারু মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে, তখন রুণা ও রুণার মা এই ধরনের মনোভাব দেখিয়েছে। এই রাজনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব শুধু আশরাফ বা খানদানি মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয়, সেই সময়ে সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানদের দিক থেকে ঐ ধরনের মনোভাব দেখা গিয়েছিল। তাই বিরোধী দলের সোহারাব এলাকার আলেম মৌলানাদের নিয়ে মুসলমান সমাজে এই রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তীব্র অপপ্রচার চালিয়েছিল। এই রাজনৈতিক দল তো আল্লাহ্-খোদা মানেনা। তারজন্য সোহারাবের পক্ষে এই রাজনৈতিক দল থেকে মুসলমান সমাজকে সরিয়ে আনার কাজটি সহজ হয়েছে।

'ডালিম গাছের জিনটি' গল্পে মুসলমান সমাজের জিন বিশ্বাসের প্রসঙ্গ বারে বারে এলেও পুরো গল্পটিতে রয়েছে গ্রামীণ রাজনীতির পটভূমি। দুর্গারজি নির্দলপ্রার্থী।তিনি রাজনীতি করেন মন্ত্রী হবার জন্য নয়, **"ভোটে না গেলে মাঠ বাঁচান কঠিন হয়"।**[১০] রাজনৈতিক দলের সহায়তায় তিনি ভেস্টেড জমি আত্মসাৎ করেন। দিলবাহারের পিতা জেরাত মির্জার একশো বিঘে জমিও ভেস্টেড বলে এইভাবে দখল করেছেন। শুধু তাই নয় নাসিরের মতো পোষা গুণ্ডাকে দিয়ে তাঁকে হত্যাও করিয়েছেন। এবারের ভোটে জেরাত মির্জার শিক্ষিতা মেয়ে দিলবাহার বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। দিলবাহার হরেন মাস্টারের হয়ে ভোটের প্রচারে নেমেছে। এই কাঁটাকে সরানোর জন্য হত্যা নয়, কৌশলে কাজ হাসিল করেছেন। নাসিরের সাথে দিলবাহারের একটা সম্পর্ক তৈরী করতে উৎসাহ দিয়ে নাসিরকে খুন করেছেন তিনি। ভোটের মুখে লাশ পড়া,খুন হওয়া এমন কোন বড় ব্যাপার নয়,তবে নাসিরের খুনের ঘটনায় দোষী সাবস্ত্য হল দিলবাহার, **"খবর হয় মিটিংগুলানে,হরেন মাস্টার মির্জার বেটিকে দিয়ে নাসিরকে টেনে এনে খতম করেছে। মির্জার বেটিকে দিয়ে নাসিরকে টেনে খতম করেছে। মির্জার বেটি টোপ ছিল। সাক্ষী ভৈরব?"**[১১] আইনরক্ষকরা মির্জার মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে এসে লক্ষ্য করলেন যে, সে উঠোনের ডালিম গাছটিকে কুপিয়ে কাটছে। সুতরাং জিনটি এবার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই গল্পে দেখিয়েছেন যে খারাপ জিন বা মন্দ জিন নয়, রাজনৈতিক চক্রান্তই মির্জার মেয়ে দিলবাহারের চরিত্রের নিয়ামক হয়ে উঠেছে।

'নবাবনন্দিনী' গল্পটি নবাববাড়ির কন্যা বিব্বু বেগমের কাহিনি। তার পিতা নিঃসম্বল অবস্থায় মারা যান আর তার চাচাও নিজের ভিটেটুকু বেচে দিয়েছেন নবাববাড়ির চাকর জাহাংগীর পাঠানকে। এই জাহাংগীর পাঠান চামড়ার ব্যবসা করে বর্তমানে হয়ে উঠেছে ধনী। শুধু তাই নয় সে বর্তমানে শহরের বড় বড় মস্তান ও চেলাচামুন্ডার নেতা। অফিসাররা সেটলমেন্ট রি-চেকিংইয়ে এলে এই জাহাংগীর পাঠান কাগজ পত্র দিয়ে ভিটের দাবি তুলতে চেয়েছে। কিন্তু গল্পকথক সেটলমেন্ট র-চেকিংয়ের একজন অফিসার হিসেবে বিব্বু বেগমকে আশ্বাস দেন যে ভিটে থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হবেনা। কারন দখলদারি বা যিনি বরাবর ভোগ করে আসছেন তিনিই হবেন আইন অনুসারে ভিটের মালিক। তাই জাহাংগীর পাঠান ভিটের দাবি নিয়ে গল্পকথকের কাছে এলেও তাকে পাত্তা না দিয়ে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতা ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সেই জাহাংগীরের দাবি নিয়ে গল্পকথকের কাছে আসেন। কারন বিব্বু অপোজিশন পাটির সাথে থাকে আর তাছাড়া তাঁর কথায়:

ব্রাদার একটা কথা বলি, জাহাংগীর পাঠান আমার ডানহাত বলতে পারেন।এই শহরে তাবৎ মস্তান ওর চেলাচামুন্ডা। তার ওপর ওর ছেলে ফরিদ –ফরিদের নাম আপনি শোনেননি,ফরিদ আমাদের রাজনৈতিক দলের ইয়ং লিডার। ওকেই সামনের ইলেকশনে আমাদের পাটি দাঁড় করাচ্ছে।কোয়ালিফায়েড ছেলে,-অসধারণ যোগ্যতা আছে।বাবা গুন্ডা হতে পারে ছেলে তো তা নয়। তাছাড়া ব্রাদার মুসলিম প্রধান এলাকা-কাজেই ফরিদ অনিবার্য, এবং যেহেতু ফরিদের বাবা হচ্ছে জাহাংগীর পাঠান,তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি নে।[১২]

তাই রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আইন হয় পরাস্ত, সৎ, সত্যবাদী ও সাহসী গল্প কথক হন পরাজিত। নিজের বিবেকের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা তাঁর। এছাড়া তাঁর 'গাবু বেঁচে আছে', 'দক্ষিণের জানালা ও কাটা মুণ্ডুর গল্প' ও 'কাঞ্চি, বদন এবং বাঁকার গল্প' প্রভৃতি গল্পে রাজনৈতিক দল, মস্তান গুণ্ডা ও তাদের দাপট এবং খুনোখুনির চিত্র উঠে এসেছে। এইধরনের গল্পগুলিতে সমকালের নকশাল রাজনীতির চিত্রও উঠে এসেছে। নকশাল রাজনীতির চিত্র উঠে এসেছে তাঁর 'গাজনতলা' গল্পটিতে। গাজনতলায় গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিচিত্র মানুষের জীবন ও তাদের জীবন রহস্য যেমন উঠে এসেছে গল্পে, তেমনি নকশাল আন্দোলনকারী হিসেবে বোরজে মহাশয়ের জামাইয়ের প্রসঙ্গটি এসেছে। গাজনতলায় যখন সবাই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছে, তখন সি. আর .পি .এফ এর দল গ্রামে হানা দিয়েছে নকশাল আন্দোলনকারী বোরজে মহাশয়ের শহুরে জামাইকে ধরতে। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে বিচিত্র চরিত্র ও বৃহত্তর সময়ের কথা তুলে ধরেছেন। সেখানে এইভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ বা নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গটি খুব হাল্কাভাবে তিনি তাঁর গল্পগুলিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এখানে এইধরনের ঘটনাগুলি গল্পের চরিত্রের ক্ষেত্রে কতোটুকু প্রভাবিত করে তা দেখান। এইধরনের ঘটনার পূর্ণ চিত্র উপস্থাপন তাঁর এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। এইভাবে 'গাবু বেঁচে আছে', 'দক্ষিণের জানালা এবং কাটা মুণ্ডুর গল্প', এবং 'কাঞ্চি, বদন এবং বাঁকার গল্প' প্রভৃতি গল্পতেও নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে গল্পের চরিত্র প্রসঙ্গে।

সাধারণ গ্রামীণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা কতটা তার পরিচয় রয়েছে 'অক্রুরের গল্প' নামক গল্পে অক্রুরের প্রশ্নে- **"ইন্দিরে গান্ধী বড়ো,না এড্ডি বড়?**[১৩] তাই গ্রামের লোকেরা আজ তত অজ্ঞ নয়। নিরক্ষর লোকেরাও আজ দেশ ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। এমন কী রাজনৈতিক নেতা হয়ে ওঠে। তবে অক্রু তা হয়নি। আবার পঞ্চায়েতে অক্রুরের মতো মানুষেরা সামান্য সাহায্যটুকুও পায়না। এর পাশাপাশি গল্পে রয়েছে জমির বর্গাদারি ও জোতদার লেঠেলদের সঙ্গে সংঘর্ষ। 'অনুপ্রবেশ' গল্পে উদ্বাস্তু তথা বিপন্ন মানুষকে নিয়ে রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। মন্দির মসজিদ নির্মাণ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির প্রসঙ্গ রয়েছে। মন্দির মসজিদ নির্মাণ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী হয়েছে ভেস্টেড ল্যান্ড-কে কেন্দ্র করে। উদ্বাস্তু তথা বিপন্ন মানুষকে নিয়ে রাজনীতির কথা উঠে এসেছে গল্পে প্রত্যক্ষভাবে:

সেবার শরতে পদ্মার ভাঙনে দু-দশ গাঁয়ের লোক উদ্বাস্তু হল। সদরে এমার্জেন্সি বৈঠক বসল। ত্রাণমন্ত্রী এলেন। পোড়ো খাসজমির তালিকা দাখিল হল। জেলা পরিষদের সভাপতির মাথায় রায়পুরের তিন একর ঢুকেছিল। আঙুল রাখতেই ভাঙন এলাকার অঞ্চলপ্রধানরা হইহই করে উঠলেন। ওটা তো রাঢ় এরিয়ার।অনেক দূর।বেপার্টির প্রধানরা হইচইয়ের মধ্যে প্ল্যাকার্ড নাড়ার মতো ধ্বনি দিলেন, অনুপ্রবেশকারী। অনুপ্রবেশকারী।ত্রাণমন্ত্রী ধমক দিলেন, চুপ করুন। বিপন্ন মানুষ নিয়ে রাজনীতি আমরা করিনা। রায়পুরের বি ডি ও-র দিকে তাকালে তিনি নম্রভাবে বললেন, ফ্যামিলিপ্রতি পাঁচ কাঠা যথেষ্ট স্যার। এই তিন একর একটা হেডেক স্যার। রাহাজানির ডিপো। তাছাড়া কমিউন্যাল বেধেছিল -- ভবিষ্যতে বাঁধতে পারে।[১৪]

সুতরাং আর সেই রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের ছায়া সুনিবিড় শান্ত গ্রাম নেই। গ্রামীণ মানুষ ও তাঁদের জীবন আজ পুরোপুরি রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভোট বা ক্ষমতার লড়াইয়ে বিভিন্ন সময়ে চলে খুনোখুনি ও মারামারি। গ্রামীণ এই রাজনীতির দ্বারা আদর্শ ব্যক্তির জীবন হয় সংকুচিত, নিজ সম্পত্তি থেকে অনেক সময় হতে হয় বিতাড়িত। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থেকে অনেকে হয় বিরাট সম্পত্তি অক্ষমতার অধিকারী। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপরোক্ত আলোচিত ছোটগল্পগুলিতে এই চিত্রগুলির পাশাপাশি মিলেছে আরও অনেক চিত্র।

উল্লেখপঞ্জি:

১। গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (দ্বিতীয় খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন কলকাতা ৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ-মাঘ , ১৪১৯, পৃষ্ঠা ৪।

২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি, ঐক্য পত্রিকা, সম্পাদক গৌরীশংকর সরকার, হবিবপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১০১, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪৫।

৩। অনিন্দ্য সৌরভের দ্বারা সাক্ষাৎকার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মুখোমুখি, ঐক্য পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩৫।

৪। অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭), এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫।

৫। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ছবির মানুষ, গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৬৬।

৬। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গাছটা বলেছিল, (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪।

৭। অমিত ভট্টাচার্য (সাক্ষাৎকার), মৌলবাদ ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিবারাত্রির কাব্য, সম্পাদক আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, মৌলবাদ ও সম্প্রীতি সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০২, পৃষ্ঠা ৪১৫।

৮। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্যাটলার, গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৯। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, স্রোত, গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৯।

১০। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ডালিম গাছের জিনটি, গল্প সমগ্র (৫ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ৩০।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯।

১২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নবাবনন্দিনী ,গল্প সমগ্র(৫ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩।

১৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অক্রুরের গল্প (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৩।

১৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অনুপ্রবেশ, গল্প সমগ্র (৪থ খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৭।